বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

‘কপালকুণ্ডলা’

পুনর্লিখন

সঞ্জীব দেবলস্কর

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
শিলচর

বর্তমান বইটি সাহিত্য সংসদ, কলকাতা–৯ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী প্রথম খণ্ড (উপন্যাস সমগ্র) গ্রন্থে (পঞ্চম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭৬) সংকলিত 'কপালকুণ্ডলা'র উপর ভিত্তি করে পুনর্লিখিত।

মূল গ্রন্থ প্রকাশ : ১৮৬৬

বর্তমান প্রকাশ : ২০২৫

গ্রন্থ স্বত্ব : বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন,
শিলচর, আসাম

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর, এর অন্তর্গত দূর–শিক্ষাকেন্দ্রের একবছরকালীন বাংলাভাষা ডিপ্লোমা পাঠক্রমের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে, শিক্ষাধিকারিক সঞ্জীব দেবলস্কর কর্তৃক পুনর্লিখিত, শিলচর সানগ্রাফিকস, উল্লাসকর দত্ত সরণি, শিলচর কর্তৃক মুদ্রিত এবং সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক গৌতমপ্রসাদ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রারম্ভিক পর্ব

১.

প্রাক্ –কথন

বাংলা সাহিত্যের অমর স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কপালকুণ্ডলা’— উনিশ শতকের সাহিত্যভুবনের এক দীপ্ত নক্ষত্র। তাঁর কলমে জন্ম নেওয়া বন্দে মাতরম্— যে গান আমাদের আত্মপরিচয়ের গভীরে চিরস্থায়ী আলো জ্বেলে রেখেছে— তার ১৫০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল যাত্রাপথে আমরা আজ নতুন করে তাঁর সাহিত্যস্থান স্মরণ করছি। এই স্মরণ আমাদের কাছে শুধু নৈর্ব্যক্তিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নয় এটি ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি এবং বইপড়ার আনন্দকে নবীন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক সজাগ প্রয়াসও বটে।

ভারত সরকারের ঘোষণায় বাংলা আজ ‘ক্লাসিকাল ভাষা’— এ আমাদের গৌরব। এই স্বীকৃতি আমাদের ভাষার ঐতিহ্য, ব্যাকরণ, শব্দসম্ভার ও সাহিত্যরূপের অনন্য শক্তিকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই পরম মুহূর্তে আমরা নবীন পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি ‘কপালকুণ্ডলা’–র সংক্ষিপ্ত ও সহজপাঠ্য রূপান্তর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গল্পের সরল উপস্থাপনা শিশু–কিশোর কৈশোরোত্তীর্ণ পাঠকদের কেবলমাত্র রোমাঞ্চের জগতেই নিয়ে যাবে তা নয়, এ পাঠ বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর মানবিকতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বোধকেও সহজে স্পর্শ করবে।

আজকের প্রযুক্তি–নির্ভর সময় নতুন প্রজন্মকে বই থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বই আমাদের শুধু তথ্য তত্ত্ব ও তথ্যের জোগানই দেয় না, বই আমাদের ভাবতে শেখায়, অনুভব করতে শেখায়, মনকে প্রসারিতও করে। যে সমাজ বই পড়ে, সেই সমাজেই সৃজনশীল চিন্তা, সহমর্মিতা এবং

মানবিকতার বিকাশ ঘটে। এ বিবেচনায়ই বঙ্গ সাহিত্যের দূর–শিক্ষা কেন্দ্র তরুণ প্রজন্মের জন্য নবরূপে ধ্রুপদী গ্রন্থ উপস্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে যাতে তারা আনন্দে পড়তে পারে, ভাবতে পারে এবং সাহিত্যকে আপন করে নিতে পারে।

আমরা আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নবীন প্রজন্মের পাঠাভ্যাস জাগিয়ে তুলবে, তারা ক্লাসিক সাহিত্য পাঠে আগ্রহী হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং আমাদের ভাষার শাশ্বত ঐতিহ্যকে সামনে রেখে আমরা এই উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি।

শিলচর, ১১ নভেম্বর ২০২৫

ড. বিভাসরঞ্জন চৌধুরী
আচার্য, দূর–শিক্ষাকেন্দ্র,
বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও
সংস্কৃতি সম্মেলন

২.

একটা সময় দেশ–বিদেশের মহৎ গ্রন্থগুলির কিশোর সংস্করণ খুব সহজলভ্য ছিল। কলকাতার আশুতোষ লাইব্রেরি, দেবসাহিত্য কুটির, শরৎ সাহিত্য ভবন প্রভৃতি প্রকাশনা সংস্থার বই দিয়েই মূলত বাংলা এবং বাংলা ভাষাঞ্চলের শিশু কিশোরদের পাঠজীবনের সূচনা হত। এই বইগুলির হাত ধরেই তারা ধীরে ধীরে প্রবেশ করত বাংলা এবং বিশ্বসাহিত্যের বৃহত্তর পরিসরে।

কিন্তু প্রায় অর্ধশতক ধরে সেই ধারা যেন থমকে গেছে। এখন আর ঘরে ঘরে সহজ ভাষায়, আকর্ষণীয় মুদ্রণে, ক্ষুদ্র কলেবরে প্রকাশিত সচিত্র ধ্রুপদী গ্রন্থের জোগান নেই। একসময় ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা', শেক্সপিয়রের ট্রাজেডি ও কমেডি, টলস্টয়ের গল্প এইসব সংস্করণের মাধ্যমেই আমাদের ঘরে প্রবেশ করেছিল। পাশাপাশি ছিল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'প্রহেলিকা' ইত্যাদি রোমাঞ্চকর সিরিজের অটেল বই। হেমেন্দ্রকুমার রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগি, লীলা মজুমদার প্রমুখ লেখকদের বইয়ের পাশাপাশি অনূদিত 'রবিনসন ক্রুশো', 'ট্রেজার আইল্যান্ড', 'ডেভিড কপারফিল্ড' ছিল আমাদের অপরিহার্য পাঠ্য। সেই সঙ্গে 'পঞ্চতন্ত্র', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'সহস্র এক আরব্য রজনী'— সব মিলিয়ে বইয়ের জগৎ ছিল এক অপরিসীম আনন্দলোক।

বইয়ের সঙ্গে সেই নিবিড় সম্পর্কের দিনগুলি আজকের ই–বুক, ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমের যুগে ক'জনই বা মনে রাখে! মশচর্চার পর্যাপ্ত অবকাশ থাকা সেই দিনগুলোয় বই–ই ছিল শিশু কিশোর যুবক বৃদ্ধদেরও একমাত্র অন্তরঙ্গ সঙ্গী। তখনকার পাঠপ্রিয় শিশু কিশোরদের অনেকেই পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, শিক্ষক, গবেষক বা সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন— তাদের মানস গঠনে সেই শৈশবের পাঠাভ্যাসের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

আজকের প্রজন্মের শিশু–কিশোরদের আগামী দিনের পাঠক ও লেখক হিসেবে গড়ে তোলার প্রাথমিক শর্ত এখানে নিহিত— তাদের হাতে উন্নত

মানের বিপুল সংখ্যক বই তুলে দেওয়া খুবই প্রয়োজন, যা দেশ–বিদেশের সাহিত্য ও মাতৃভাষার মহৎ গ্রন্থের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ের সুযোগ করে দেবে।

ই–বুকের অস্তিত্ব আজ অপরিহার্য, তবু তার পাশাপাশি মুদ্রিত গ্রন্থের— আজকের পরিভাষায় হার্ড কপির প্রয়োজনও অটুট। ভার্চুয়াল পাঠ নিঃসন্দেহে একটি নতুন অভিজ্ঞতা, কিন্তু তা এক অর্থে প্রক্সি রিডিং বা পরোক্ষ পাঠও বটে। এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে না গিয়েও আমরা দৃঢ়ভাবে বলি— মুদ্রিত বইয়ের পাশে দাঁড়ানো মানে পাঠ–সংস্কৃতির আসল স্বাদ ও গভীরতাকে রক্ষা করা।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা'–র দুটি কিশোর সংস্করণের কথা অনেকেই জানেন— দেবসাহিত্য কুটির প্রকাশিত নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুনর্লিখিত সংস্করণটি এখন দুষ্প্রাপ্য, আর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত অপর সংস্করণটির প্রকাশনা সংস্থা, শরৎ সাহিত্য ভবন, বহু আগেই অস্তিত্ব হারিয়েছে। তাছাড়া আরও কয়েকটি কিশোর সংস্করণের সংবাদ আমরা পেয়েছি এরমধ্যে একটির প্রকাশক শ্রী হরিপদ বিশ্বাস, প্রকাশকাল ১৯৫১ সালের জুলাই মাস, এবং বইটি প্রকাশিত হয়েছে আদিত্য প্রকাশনালয়, কলিকাতা–৯ থেকে। এ বইটিও বলাবাহুল্য দুষ্প্রাপ্য। এই বিবেচনাতেই বর্তমান সংস্করণের পরিকল্পনা। মূলত বঙ্গসাহিত্যের দূরশিক্ষাকেন্দ্রের ডিপ্লোমা পাঠক্রমের 'যা পিড রিডার' হিসেবে বইটি পরিকল্পিত হলেও, বিদ্যায়তনিক পরিসরের বাইরেও বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলীর প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে।

সঞ্জীব দেবলস্কর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
‘কপালকুণ্ডলা’

সে আজ থেকে প্রায় আড়াই শো বছর আগের কথা। গঙ্গাসাগর থেকে নৌকা করে একদল তীর্থযাত্রী ফেরার পথে সুন্দরবন সংলগ্ন সমুদ্র মোহনার কাছাকাছি এসে গভীর কুয়াশার মধ্যে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ভয়ে ভীত হয়ে সবাই মাঝিকে নির্দেশ দিচ্ছে, শাপশাপান্ত করছে, কেউ বা বাড়িঘর সংসার পরিজনের কথা ভেবে বিলাপ শুরু করছে।

এদের সমস্ত ভয় আশঙ্কা দূর করে যখন সূর্য উঠল তখন মাঝিরা বুঝতে পারল এরা রসুলপুরের কাছাকাছি। সবার মুখে হাসি ফুটল। যাক বাবা, প্রাণটা অবশেষে রক্ষা পেল। এতক্ষণ বিপদের মুহূর্তে কারও মনেই হয়নি কথাটা ইতিমধ্যে যে খাওয়া দাওয়াই হয়নি যাত্রীদের। এখন সবাই ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। নৌকা পাড়ে লাগিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখে চুলো জ্বালানোর কাঠ নেই।

একদিকে খরস্রোতা নদী, অপরদিকে সমুদ্রের খাড়ি আর আরেকদিকে গভীর অরণ্য। দিনের বেলাই অন্ধকার করে আছে গাছের ঘন ছায়া। যারা রান্না করবে এরা বলল জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতে হবে। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের মধ্যে কেউই নিজের জীবন বিপন্ন করে এ কাজে যেতে রাজি হল না।

অরে বাবা! এ ভীষণ বনে কে যাবে? এরা লক্ষ্য করছিল সহযাত্রী এক নবীন যুবককে। কেউ যখন সাহস দেখাতে রাজি হল না, সে কুঠার কাধে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু কেউই প্রাণভয়ে তার সঙ্গে যেতে রাজি হল না।

অগত্যা নবকুমার একাই জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল। তাঁর ডর ভয় একটু কম।

বনের ভিতর ঢুকে দেখল কাজটি খুব সহজসাধ্য নয়। অনেক খুঁজে পেতে একটি মাঝারি ধরনের গাছ পেয়ে এ থেকেই কাঠ সংগ্রহ করবে ঠিক করে অনেক কষ্টে এবং সময় লাগিয়ে একটি বোঝা বানিয়ে মাথায় করে এসে দেখে নদীতট একেবারে শূন্য। না নৌকা, না তার জন্য অপেক্ষারত একটি প্রাণী। তার মাথায় এটা আসেনি যে যাত্রীরা তাকে ফেলেই চলে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা–ই হল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভাবল জোয়ারের টানে নৌকা ভেসে গেছে হয়ত, এখন ভাঁটা এলেই তাকে নিতে ফিরে আসবে। কিন্তু হায়! ভাঁটার টানে নৌকা তো ফিরে এল না। এখন সে প্রকৃতই বিপন্ন বোধ করল।

ওদিকে সহযাত্রীরা নবকুমারের জন্য অপেক্ষা করতে পারল না, ফিরে তাকে নিতে আসা তো দূরের কথা। অথচ সে তাদের জন্যই রান্নার কাঠ আনতে গিয়েছিল। পালে হাওয়ার টানে ভেসে যাওয়া নৌকার আরোহীদের মধ্যে যারা সেয়ানা তারা বলল নবকুমার তার ব্যবস্থা নিজেই করে নেবে, অবশ্য যদি না ইতিমধ্যে সে শেয়ালের পেটে গিয়ে থাকে।

দেশবাড়িতে শুনেছে প্রবাদ 'উপকারীকে বাঘে খায়'। তা–ই বুঝি ফলে যাচ্ছে আজ তাঁর জীবনে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সে বুঝল তার আর নিস্তার নেই। কোথায় সহযাত্রীদের নৌকা, কোথায় খাবার আয়োজন, কোথায়ই বা ক্ষুধা আর তৃষ্ণা!

নির্জন সমুদ্রের তীরে নবকুমার একদম একা।

যখন সত্যি সত্যি সন্ধ্যা নেমে এল নবকুমার বুঝল— এখন তার বাঁচার আর কোনও উপায় নেই। না আছে নৌকা, না আছে খাবার, না আছে সঙ্গী। হতাশ হয়ে অনেকক্ষণ সমুদ্রতটে পাগলের মতো ছুটোছুটি করল, চিৎকার করল। তারপর একসময় ক্লান্ত দেহে একটি বালির ঢিবিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর মন অবসন্ন। এ অবস্থায় কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল, নিজেই বুঝতে পারল না। ভয়, অভিমান, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাগ— সব কিছু যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

২.

সেই অত্যাশ্চর্য ঘুম যখন ভাঙল তখন মধ্যরাত। নবকুমার চোখ মেলে দেখে; আকাশে মিটি মিটি তারা জ্বলছে, ঠিক তাঁর গ্রামের আকাশে যেমন দেখা যায় তেমনি। দূরে কোথাও বাঘ আর শিয়ালের ডাক শোনা যায়। এবার তার ঠিকই মনে হল— সে একা, সবাই তাকে সত্যিই ফেলে গেছে। রান্নার কাঠ আনতে গিয়ে সে নিজেই এ বিপদ ডেকে এনেছে নিজের জীবনে।

অবাক হয়ে ভাবল নবকুমার এতক্ষণ বাঘ–ভাল্লুক তাকে ধরল না, এ যে ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার!

এমন সময় অনেক দূরে একটা বালির ঢিবির ওপরে দেখতে পেল আগুন জ্বলছে। প্রাণ ফিরে এল নবকুমারের। বাঁচার আশা আছে তাহলে। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল নবকুমার। যেভাবেই হোক, ওই আগুনের কাছে পৌঁছাতে হবে— তা সে যত দূরেই হোক না কেন। এখন হার মানলে চলবে না।

তারার আলোয় পথ দেখে নবকুমার ছুটে চলল আগুনের দিকে, বাঁচার আশা নিয়ে।

ক্লান্ত দেহে নবকুমার এগিয়ে চলল। একটার পর একটা বালির ঢিবি, কাঁটার ঝোপ আর উঁচুনিচু পথ পার হয়ে সে পৌঁছোল আগুনের সামনে। আগুনের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল, বাঘছাল পরা ভয়ঙ্কর দর্শন এক কাপালিক মস্তক বিহীন একটি গলিত শবের উপর বসে ধ্যান করছে। সামনে ছড়ানো নর করোটি, মানুষের হাড়গোড়, পানপাত্র, আর পাশে বিশাল হাড়িকাঠে সিঁদুর লেপা এক খড়্গ। প্রচণ্ড দুর্গন্ধময় এ স্থান। দৃশ্যটি রীতিমত ভয় জাগানো, বিভীষিকার মতো। নবকুমার বুঝে গেল, এ কোনও নিরাপদ আশ্রয় নয়। কিন্তু আর তো কোনও আশ্রয় নেই আপাতত।

বুঝল সে কাপালিকের খপ্পরে পড়তে যাচ্ছে। কাপালিক সম্প্রদায়ের ভয়াল সাধনা সম্বন্ধে নবকুমারের কিছুটা ধারণা আগেই ছিল— এরা বন্য জন্তুর চেয়েও কম হিংস্র নয়। তবু সেই অসহায় অবস্থায় এ কাপালিকের শরণ

নিতেই হবে।

অনেকক্ষণ পরে কাপালিক ধ্যান ভেঙে চোখ খুলল। তার দৃষ্টি পড়ল নবকুমারের ওপর। গম্ভীর স্বরে একটিই প্রশ্ন করল, 'কঃ স্তম?'

নবকুমার বুঝতে পারল— প্রশ্নটা সংস্কৃতে। সেও সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'ব্রাহ্মণ।'

কাপালিক বলল, 'তিষ্ঠ।' এ শব্দটি উচ্চারণ করে আবার ধ্যানমগ্ন হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর ধ্যান ভেঙে নবকুমারের দিকে ফিরে কাপালিক জানতে চাইল তার কথা। নবকুমার জানাল, সে সহযাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং এ মুহূর্তে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। সে জানতে চাইল কোথায় গেলে খাবার এবং একটু জল পেতে পারে।

কাপালিক বলল, 'ভৈরবী প্রেরিতঅসী, মমানুসরদ— অর্থাৎ তোমাকে ভৈরবী পাঠিয়েছেন, আমার সঙ্গে এসো।'

নবকুমার যন্ত্রের মতো কাপালিকের পেছনে পেছনে চলল। একসময় পৌঁছোল একটি লতাপাতার কুটিরের সামনে। দরজা খুলে তাঁকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল কাপালিক, একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখাল— ভিতরে কলসিতে জল, কিছু ফলমূল রাখা আছে। সে বলল, 'এগুলো খেয়ে নাও, বাঘছালের উপর শুয়ে পড়।' নবকুমারকে রেখে চলে যাওয়ার আগে কাপালিক বলে গেল, 'বাঘের ভয় কোরো না। আর আমি না–ফেরা পর্যন্ত এখান থেকে কোথাও যেও না।' এ কথা বলে সে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পরদিন দুপুর পর্যন্ত কেউ না আসায় নবকুমার কুটিরের বাইরে এসে সামনের একটি গাছ থেকে কিছু ফল পেড়ে খেল। তারপর পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় এসে দাঁড়াল সমুদ্রের তীরে।

চোখের সামনে অনন্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে নবকুমার সব ভুলে গেল। ভুলে গেল সে কোন পরিস্থিতিতে এখানে এসেছে, ভুলে গেল সহযাত্রীদের নিষ্ঠুর আচরণের কথা, একা সমুদ্রতীরে তাঁর বিপন্ন অবস্থার কথা, পূর্ব রাত্রির অভিজ্ঞতা। তাঁর চোখের সামনে অনেক দূরে একটি জাহাজ পাল তুলে চলেছে কোন অচেনা বিদেশে। অবাক বিস্ময়ে দেখছে নানা ভঙ্গিতে সমুদ্র জলের তরঙ্গ, বিক্ষিপ্ত ফেনাররাশি কোথা থেকে আসে কোথায় যায়!

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। হঠাৎ সম্বিত ফিরে এল কুটিরে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু ঘনায়মান অন্ধকারে সে বুঝতে পারছে না কোন দিকে যেতে হবে। চারিদিকে একই ধরনের ঝোপ, লতাগুল্মে ভরা গাছগাছালি। রাস্তা বলে কিছু তো নেই। দিশেহারা নবকুমার এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল। এখন কী করে? এমন সময় দেখে সামনে এক লম্বা চুল দীর্ঘদেহী নারীর অবয়ব। এটা মনের ভ্রম না বাস্তব বুঝতে পারছে না নবকুমার। নীরবতা ভাঙল নারীমূর্তির উচ্চারণ, 'পথিক, তুমি পথ হারিয়েছ?'

৩.

কাপালিকের দেখা মিলল এরও পরের দিন সন্ধ্যায়। এই দুটো দিন বিশেষ সিদ্ধি কামনায় কাপালিক ভৈরবীর পূজা সাঙ্গ করে এসেছে কি না নবকুমারের জানার কথা নয়। এসেই নবকুমারকে তাঁর সঙ্গে যেতে আদেশ করল। নবকুমারও তাঁর সঙ্গে চলল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পদে পদে হোঁচট খেয়ে চলতে চলতে সে বারবারই কাপালিকের থেকে অনেক পিছনে পড়ে গেল। এমন সময় হঠাৎই দেখে গতকাল সন্ধ্যায় দেখা সেই নারীমূর্তি তাঁর সামনে। চাপা কণ্ঠে নারী বলল 'পথিক, পালাও।'

হতভম্ব নবকুমার তবুও কাপালিকের পিছনেই চলতে থাকল। আবার ঝটিতি সেই নারীটি দৌড়ে এসে একই সাবধান বাণী শোনালো। কিন্তু কাপালিক পিছন ফিরে এ দৃশ্যটিই দেখে ফেলল। ক্রুদ্ধ স্বরে উচ্চারণ করল, 'কপালকুণ্ডলা!'

ছুটে পালিয়ে যেতে যেতে সেই রহস্যময়ী, কপালকুণ্ডলা যার নাম, বলে গেল, 'এক্ষুণি পালিয়ে যাও, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও। কাপালিক তোমাকে নিয়ে কী করবে তুমি জানো না?'

কিন্তু এবার কাপালিক ছুটে এসে শক্ত হাতে নবকুমারকে ধরে টেনে হিঁচড়ে এগিয়ে চলল। নবকুমার বুঝল তাঁর গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। টেনে নিয়ে সেই পূজাস্থলে গিয়ে নবকুমারকে একটি গাছের লতা দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে রাখল। তাঁর নড়নচড়নের আর ক্ষমতা নেই। চোখের সামনে পূজার সামগ্রী, একটি হাড়িকাঠ এবং সেই বিশাল খড়্গটি। নবকুমারের বুঝতে বাকি রইল না এসব তাঁরই জন্য। আজ তাঁর আর নিস্তার নেই।

পিছোমোড়া করে বাঁধা শিকার আর পালাতে পারবে না নিশ্চিত হয়ে সেই মুণ্ড বিহীন শবের উপর গিয়ে কাপালিক ধ্যানে বসল। নবকুমার বুঝল কাপালিক পূজা শেষ করে আজই ভৈরবীর পায়ে তাঁকে বলি দেবে। এমন সময় ধা–করে কোথা থেকে সেই নারী মূর্তির আবির্ভাব! সামনে রাখা খড়্গ দিয়ে সে ক্ষিপ্র গতিতে লতার বাঁধন কেটে দিয়ে নবকুমারকে মুক্ত করে ইশারা

করল তাঁর পিছনে পিছনে ছুটতে। সমস্ত ব্যাপারটি ঘটে গেল একেবারে আচমকাই।

এরপর অন্ধকার বনপথে চলল দীর্ঘ দৌড়। নবকুমার অপরিচিতার পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল প্রাণপণে। কোথায় যাবে, কাপালিক তাঁকে না পেয়ে কী করবে, এই মেয়েটিকেই বা কী করবে সে কিছুই জানে না, কেবল জানে তাঁর প্রাণ বাঁচাতে আসা মেয়েটির নাম কপালকুণ্ডলা।

গভীর অরণ্যে সমস্ত বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে সেই নারীর পিছনে ছুটছে নবকুমার। অবশেষে পৌঁছোল এক পুরোনো মন্দিরের কাছে। এত রাতে দরজায় আঘাত শুনে বৃদ্ধ পুরোহিত বেরিয়ে এসে ওদের তৎক্ষণাৎ ভেতরে ঢুকিয়েই দরজা বন্ধ করে দিলেন। কপালকুণ্ডলা অতি সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটি বলে পথিক কে তার ওখানে রেখে সেই রাত্রেই আবার নিজস্থানে ফিরে যেতে চাইলে পুরোহিত এর পরিণাম কী হবে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জানেন তান্ত্রিক সাধনায় বিঘ্ন ঘটানোয় এতক্ষণে প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে কাপালিক এদের খুঁজতে বেরিয়েছে। কপালকুণ্ডলা ফিরে গেলে আজ তাঁকে বলি দিয়েই অসম্পূর্ণ পূজা সাঙ্গ করবে।

এখন পুরোহিতের সামনে একটিই রাস্তা খোলা— এদের নিরাপদে এখান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা। রাত শেষ হলেই কাপালিক এদের খোঁজে আসবে। সে এখন ক্রোধে উন্মাদ হয়ে আছে নিশ্চয়ই। আপাতত এদের এখানে লুকিয়ে কাল যা করার করবেন সিদ্ধান্ত নেবেন মন্দিরের অধিকারী। তিনি কপালকুণ্ডলাকে ফিরে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করলেন। ক্লান্ত বিধ্বস্ত নবকুমারকে বিশ্রামে পাঠিয়ে অধিকারী মশাই গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন কন্যাসম কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের সম্বন্ধ হতে কোন অসুবিধা নেই। নবকুমারের পরিচয় ইতিমধ্যেই তিনি জেনে গেছেন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠাতা মা কালীকে সাক্ষী রেখে যথাবিহিত শাস্ত্রমতে এদের বিবাহ সম্পন্ন করিয়ে এদের দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্তই নিলেন। এবং পিতৃকর্তব্য হিসেবে এ বিয়েতে নিজেই কন্যা সম্প্রদান করবেন স্থির করলেন।

পরদিন শাস্ত্র মতে অধিকারী নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিয়ে

সম্পন্ন করে নিজেই সঞ্চিত কিছু অর্থ যৌতুক হিসেবে দিয়ে এদের মেদিনীপুরের রাস্তা ধরিয়ে দিয়ে তাঁর সঞ্চিত কিছু অর্থ দিয়ে বললেন কপালকুণ্ডলার জন্য যেন একটি পালকি ভাড়া করে তাঁরা সপ্তগ্রাম অভিমুখে যেন এগিয়ে যাক।

কাপালিকের পালিতা কন্যা অরণ্যচারী কপালকুণ্ডলাকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে তুলে দিতে পেরে অধিকারী নিজেও ভারমুক্ত হলেন।

৪.

তখনকার দিনে আজকের মতো রাস্তাঘাট এত সহজ, প্রশস্ত এবং বিপদমুক্তও ছিল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলতে চলতে মেদিনীপুর পৌঁছে বাহক সহ একটি পালকিতে কপালকুণ্ডলাকে উঠিয়ে দিয়ে নবকুমার নিজে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলল। বাহকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে পথশ্রমে ক্লান্ত নবকুমার ক্রমাগতই পিছিয়ে পড়তে লাগল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আকাশও মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ঝির ঝির বৃষ্টিও নামছে। চলতে চলতে অন্ধকারের নবকুমার দেখে একটি ভাঙা পালকি পড়ে আছে পথের উপর। স্বভাবতই কপালকুণ্ডলার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল নবকুমার। উঁচু স্বরে জিজ্ঞেস বলল 'এখানে কপালকুণ্ডলা নাকি?' ওদিক থেকে নারী কণ্ঠে জবাব এল, 'কপালকুণ্ডলা কে, তা জানি না, তবে আমি দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নিষ্কুণ্ডলা হয়েছি।' অর্থাৎ নারী কণ্ঠ জানাল দস্যু আক্রমণ করে তাঁর অলঙ্কারপত্র সহ কানের কুণ্ডলটিও কেঁড়ে নিয়ে গেছে। আবছা আলোয় নবকুমার দেখল যাবার আগে দস্যুরা তাঁকে বেঁধে রেখে চলে গেছে। বন্ধন মুক্ত হয়ে এ নারী উঠে দাঁড়াতে সাহায্য চাইল, তাঁর পায়ে সামান্য আঘাতও লেগেছে। আবছা আলোয় নবকুমার অনুমান করল ইনি পশ্চিমা মুসলমান নারীর বেশ পরিহিতা, তবে বাংলায় কথা বলতে স্বচ্ছন্দ। নবকুমারের সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করল সামনে যদি কোনও চটি, অর্থাৎ পান্থনিবাস পাওয়া যায় এ উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়া যাক। সপ্রতিভ অভিজাত এ রমণী নবকুমারের কাঁধে ভর দিয়ে সামান্য এগিয়ে যেতেই পেয়ে গেলেন একটি পান্থনিবাস। যে পালকিটি ইতিমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে বয়ে আনছিল সে পালকিটি কিছুক্ষণ আগেই এখানে পৌঁছেছে এবং কপালকুণ্ডলা একটি কক্ষে স্থানও পেয়ে গেছেন। এদিকে নবকুমার এ সঙ্গিনীর জন্য একটি কক্ষের ব্যবস্থা করে দেবার পর পালিয়ে যাওয়া তাঁর বাকি বেহারারা সঙ্গীসহ পান্থনিবাসে এসে পৌঁছোল।

অপরিচিতা এ রমণীর জন্য আলোর ব্যবস্থা করে দিলে প্রদীপের

আলোতে দেখলেন এ অভিজাত মুসলমান রমণী অসামান্যা রূপসীও বটে। প্রাথমিক আলাপেই রমণী আভিজাত্য ও বাকচাতুর্যেরও পরিচয় দিয়েছেন। ঘরে জ্বালিয়ে রাখা প্রদীপটির সলতেটি আঙুল দিয়ে উসকে দিতে দিতে বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যে রমণী নবকুমারের ঘরনীর প্রসঙ্গ তুলে বুঝে নিল তাঁর স্ত্রীও পরমা সুন্দরী। এরপর হঠাৎই প্রশ্ন করে বসল, 'যে ঘরে এ হেন অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিনী হিসেবে আছেন, সে ঘরটি কোথায়?' অর্থাৎ সুচতুর রমণীটি জানতে চাইছে নবকুমারের নিবাস কোথায়। নবকুমারের উত্তর 'আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।'

অপরিচিতা এবার নিজের পরিচয় দিলেন, 'দাসীর নাম মতিবিবি।'

তারপর যথাযথ শিষ্টাচার রক্ষা করে বললেন 'মহাশয়ের নাম জানতে পারি কি?'

নিস্তব্ধ ঘরে নবকুমার মুখ থেকে 'নবকুমার শর্মা' শব্দটি উচ্চারিত হতেই ঝড় নেই হাওয়া নেই পিলসুজের উপর রাখা প্রদীপটি নিভে গেল।

৫.

পান্থশালায় আলাপচারিতায় যখন মতিবিবি জানলেন নবকুমারের স্ত্রী এ পান্থশালায়ই আছেন তখন তিনি নিজস্ব সহচরীসহ মহা আড়ম্বরে কপালকুণ্ডলাকে দেখতে এলেন। প্রদীপের আলোয় অনেকক্ষণ নিরাভরণা সুন্দরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ মতিবিবি একে একে নিজের নিজের শরীর থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে পরিয়ে দিতে লাগলেন। নবকুমারের কোনও আপত্তি টিকল না— 'এ সব অলঙ্কার এ অঙ্গেরই উপযুক্ত। এ সুন্দরীকে সাজিয়ে আমার যদি সুখ হয়, আপনি কেন বাঁধা দেবেন?'

কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে যখন নবকুমার সপ্তগ্রামে নিজ বাড়িতে পৌঁছল তখন বাড়ির সবাই সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা বাড়ির ছেলেকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। বিনা প্রশ্নে সঙ্গে আসা নবপরিণীতা স্ত্রীকে সাদরে বরণ করে নিলেন।

ইতিপূর্বে যারা নবকুমারের বাঘের হাতে মৃত্যুর খবর রটিয়ে ছিল, এবং বাঘটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ, লেজের মাপ ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যে কাহিনী ফেঁদেছিল এদের আওয়াজ আর শোনা গেল না।

কপালকুণ্ডলা নামটি একটু ভিন্ন ধরনের তাই শ্বশুরবাড়িতে তার নাম হল মৃণ্ময়ী। ননদিনী শ্যামাসুন্দরী নিত্য সহচরী হিসেবে তাঁর রূপসজ্জা, পরিচর্যা এসবের ভার নিল। অরণ্যচারী, তান্ত্রিক কাপালিকের পালিতা কন্যার জীবনধারণের রীতিনীতি, ইচ্ছা অনিচ্ছা অবশ্য সপ্তগ্রামের সমাজের চাইতে একটু ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। শ্যামাসুন্দরীর প্রশ্নের উত্তরে সে অকপটে সেই ফেলে আসা নির্জন সমুদ্রতীরে বনে বনে ঘুরে বেড়ানোর প্রবল আকাঙ্ক্ষার কথা স্বীকার করে। তাঁর মন টানে সেই ফেলে আসা জীবনের প্রতি।

কিন্তু এককালের বর্ধিষ্ণু নগর সপ্তগ্রামে সেই পরিবেশ কোথায় পাওয়া যাবে? কালের বিবর্তনে সেকালের জনবহুল উপনগর সপ্তগ্রামের সম্প্রতি জনশূন্য পরিত্যক্ত যে–প্রান্তে নবকুমারের বাস তার পিছন দিকে অবশ্য এক নিবিড় বনের অস্তিত্ব রয়েছে, এবং বাড়ি থেকে ওই বনের পথে লতাগুল্মে

আচ্ছাদিত পথের পাশে এক ছোট্ট খালও বয়ে চলেছে।

কয়েক শতাব্দী আগের সমৃদ্ধ বাণিজ্য নগরী সপ্তগ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটির পরিবহন ক্ষমতা কমে গেল, বাণিজ্যতরণীর আসা যাওয়াও বন্ধ হল, বণিকশ্রেণী, রাজকর্মচারী, ফৌজদার ইত্যাদি প্রশাসকেরা ক্রমে পর্তুগিজ বণিকদের প্রতিষ্ঠিত হুগলি নগরীতে সরে গেলে সপ্তগ্রামের গৌরব ম্লান হয়ে আজ প্রায় এটা পরিত্যক্ত গ্রামেই পর্যবেশিত।

৬.

বর্ধমানর পথে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার সঙ্গে যে মুসলমান রমণীর দেখা হয়েছিল, তাঁর পরিচয় নবকুমারের কাছে অজানাই রয়ে গিয়েছিল। রমণীটি সেদিন বর্ধমানের দিকেই যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে ওই পান্থনিবাসেই থেকে গেলেন। সেদিনই যে তাঁর গন্তব্য যে বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল তা কে জানত।

পশ্চিম দেশীয় মুসলমান রমণীর মতো পোশাক ও সাজসজ্জা ধারণ করলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি পশ্চিমী কেতায় অভ্যস্তা এক বঙ্গভাষী ব্রাহ্মণকন্যা। পিতৃদেব ধর্মান্তরিত হয়ে ঢাকায় উচ্চ রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত। এ সূত্রে এ কন্যার আগ্রা ও দিল্লির রাজপ্রাসাদ এবং অভিজাত মহলে বিচরণ। সেখানে তিনি পরিচিতি লাভ করেন একাধিক নামে এবং দ্রুতই উত্তরভারতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

অসাধারণ সৌন্দর্য, উচ্চকোটির সমাজরীতি–আচরণে শিখে নেওয়ার দক্ষতা, অলঙ্কারময় বাকচাতুর্য তাঁকে বিশেষ মর্যাদা এনে দেয়। রাজা–বাদশা থেকে আমির–ওমরাহ— অনেকেই হয়ে ওঠেন তাঁর সান্নিধ্যপ্রার্থী গুণগ্রাহী। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন খোদ সম্রাট আকবরের পুত্র যুবরাজ সেলিমও।

তবে সে সময়কার সমাজরীতি অনুযায়ী, বিবাহিতা হলেও ধর্মান্তরিত পিতার সন্তান হিসেবে তিনি নিজের সমাজ এবং শ্বশুরকুলে পরিত্যক্তা বলে বিবেচিত হন। তাই স্বদেশে বর্জিতা হয়ে দিল্লি–আগ্রা থেকে বর্ধমান–ওড়িশার মতো দূরপ্রদেশ শুরু হয় পর্যন্ত তাঁর বিচরণ।

৭.

যেদিন বর্ধমানের পথে এক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে নবকুমারের সঙ্গে মতিবিবির দেখা হয়েছিল, সেদিনের ঘটনার অবশ্য সেখানেই ইতি পড়েনি।

সেই সন্ধ্যায় পান্থশালায় নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়, প্রদীপ নিভে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে যখন নবকুমারের মুখে শুনলেন— তাঁর বাড়ি সপ্তগ্রাম— মতিবিবির ভেতর যেন আচমকা একটা ঝড় উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল, তাঁর আচরণে এসে গেল একটা বিরাট পরিবর্তন। মুহূর্তেই স্তিমিত হয়ে গেল তাঁর চাপল্য, থেমে গেল মুখ থেকে নির্গত সপ্রতিভ বাক্যের প্রবাহ। মাথা নিচু করে, আঙুলের ডগায় প্রদীপের সলতে উসকে দিতে ব্যস্ত হয়ে রইলেন তিনি। একটি বারও আর মুখ তুললেন না। তারপর প্রদীপ নিভে গেল।

অতঃপর আচমকা মতিবিবি নিজস্ব গন্তব্যও পাল্টে দিলেন। সঙ্গী–সাথী নিয়ে অন্য এক পান্থশালায় আশ্রয় নিলেন। সেখানেই পেলেন এক সংবাদ— দিল্লির বাদশাহ সম্রাট আকবর আর নেই।

এই সংবাদে তাঁর সমগ্র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, আসন্ন গন্তব্য, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেল। সহচরীর সঙ্গে আলাপচারিতায় বোঝা গেল, দিল্লি–আগ্রার অভিজাত রাজপরিবারের অন্তঃপুরেও মতিবিবির যাতায়াত ছিল নিয়মিত। আকবরপুত্র সেলিম— অর্থাৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সম্রাট জাহাঙ্গীর— যে–ক'জন রমণীকে অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মতিবিবিও একজন। এক্ষণে সম্রাট আকবরের মৃত্যু এবং সেলিমের রাজপদলাভে কার ভবিষ্যৎ কীভাবে পাল্টে যাবে, সহচরীর সঙ্গে আলাপচারিতায় এর কিছু আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল— বোঝা গেল সেই 'অনেকের' মধ্যখানের একজন হতে পারেন মতিবিবিও।

৮.

এক বছর কেটে গেছে। মতিবিবি আগ্রা থেকে সপ্তগ্রামে এসে থাকার জন্য নতুন এক আবাস খুঁজে নিলেন। পরিত্যক্ত নগরীর এক প্রান্তে, বিস্মিত পথিকের চোখের সামনে দাস–দাসী ও ভৃত্যে পরিপূর্ণ এক অট্টালিকা হঠাৎ করেই জীবন্ত হয়ে উঠল। বোঝা গেল, এ মহল্লার অধিশ্বরী আগ্রার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে এসেছেন। বাদশা সেলিমের সঙ্গেও একটা সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ করে সসম্মানে বিদায় নিয়েও এসেছেন।

দিল্লিশ্বরী হবার যে স্বপ্ন তিনি এতদিন বুকের ভিতর লালন করেছিলেন, তা এখন পরিত্যাগ করেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বান্ধবী মেহেরুন্নেসার জন্য সেই পথ ছেড়ে দিয়ে, সংসার করার দৃঢ় সংকল্পে তিনি এবার তিনি বঙ্গদেশে এসে পৌঁছোলেন। এ ইঙ্গিতটি অবশ্য তিনি সম্রাট সেলিমকে দিয়েও এসেছেন। তাঁর সহচরী পেশমনকে অকপটে জানালেন নিজের আশা–নিরাশার কথা, আর শোনালেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও।

আগ্রায় এতদিন কাটিয়েও কোনও প্রকৃত ফললাভ করতে পারেননি। বঙ্গদেশ ছেড়ে রাজধানীতে গিয়ে ঐশ্বর্য, ধনদৌলত, ক্ষমতার গৌরব; সবকিছু অর্জন করে একদিনের জন্যও সুখী হতে পারেননি, এ সত্য তিনি অকপটে স্বীকার করলেন। তাহলে কি সেই ভালোবাসারই টান, যার জন্য তিনি এতদিন তৃষিত ছিলেন, তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে আজ এই 'চুয়াড়ের দেশে'? শব্দটি তিনি নিজেই ব্যবহার করতেন এক সময়।

৯.

সেই যে প্রদীপ নিভে যাওয়ার ঘটনা— এর পেছনে কার্যকারণ খুঁজে দেখার আর প্রয়োজন নেই। আসলে সেদিনই মতিবিবির কাছে এই ব্রাহ্মণ যুবকের প্রকৃত পরিচয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সপ্তগ্রামের বিলাসী প্রাসাদে মতিবিবির আমন্ত্রণে নবকুমার এলে, তাঁর আরও কিছু গোপন আত্মপরিচয় প্রকাশের পালা বাকি রইল।

রাজৈশ্বর্যে ভরপুর মতিবিবির জানার আর বাকি নেই সপ্তগ্রাম নিবাসী এই নবকুমার শর্মণই আসলে তাঁর স্বামী। রাজধানীর সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে, ছিন্ন হয়ে যাওয়া দাম্পত্য–সম্পর্ককে আবার নতুন করে জোড়া লাগানোর উদ্দেশ্যেই আজ মতির এখানে আসা। সম্রাট সেলিমের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে মতিবিবি বিয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ করে যে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, তার মধ্যেও লুকানো ছিল এই পরিকল্পনা। স্বামীকে রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে সম্রাটের অনুগ্রহে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করে নতুন জীবন শুরু করাই এখন তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায়।

নবকুমার অবশ্য এখনও জানেন না মতিবিবির আসল পরিচয় কী। তাই বুঝতে পারছেন না— কোন অধিকারে এই নারী তাঁর কাছে পত্নী নয়, চরণাশ্রিত দাসীর মতোই আশ্রয় প্রার্থনা করছে!

নবপ্রতিষ্ঠিত প্রাসাদোপম আবাসে আমন্ত্রিত নবকুমারের সামনে মতিবিবির আকুল প্রস্তাবের উত্তরে নবকুমারের দৃঢ় প্রত্যাখ্যান—

‘আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এ জন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয়েই থাকব।
যবনী নারীর স্বামী হয়ে তোমার দেওয়া ধন–সম্পদ নিতে পারব না।’
তিনি আরও সতর্ক করে বললেন,
‘মতি, তুমি বিধর্মী, তুমি পরনারী।
তোমার সঙ্গে এরকম আলাপ শোভা পায় না।
এ বাড়িতে আর আসব না, আর কখনও আমাদের দেখা হবে না।’
কিন্তু মতিবিবি তাঁর পায়ের উপর পড়ে কাতর স্বরে বললেন—

‘তুমি নিষ্ঠুর! তোমার জন্যই আমি আগ্রার সিংহাসন ছেড়ে এসেছি। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করো না!’

প্রবল আবেগে নবকুমারের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন তিনি।

এই প্রথম নবকুমার তাঁকে সাপের মতো কুপিত, তেজোদৃপ্ত রূপে দেখলেন।

মুহূর্তে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল বহুকাল আগে দেখা বিস্মৃতির ওপার থেকে অনুরূপ এক দৃশ্য।

আতঙ্কিত স্বরে তিনি বললেন—

‘তুমি কে?’

রহস্যভেদ করে মতিবিবি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন—

‘আমি পদ্মাবতী।’

এবার মতিবিবির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন কপালকুণ্ডলা।

যে কপালকুণ্ডলার রূপ দেখে একদিন মতিবিবি আবেগে নিজের দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলে তাঁর গায়ে পরিয়ে দিয়েছিলেন— আজ সেই কপালকুণ্ডলার সঙ্গেই নবকুমারের চিরবিচ্ছেদ ঘটানোই মতির একমাত্র লক্ষ্য।

এ উদ্দেশ্যেই মতি পুরুষবেশ ধারণ করে সপ্তগ্রামে নবকুমারের বাড়ির কাছের সেই অরণ্যের দিকে রওনা দিলেন।

অরণ্যের গভীরে গিয়ে দেখতে পেলেন, এক তান্ত্রিক আগুন জ্বালিয়ে যজ্ঞ করছেন।

তান্ত্রিকের উচ্চারিত মন্ত্রে হঠাৎ একটি নাম শুনে চমকে ওঠেন মতি। এ নাম যে তাঁর পরিচিত। মতি ধীরে ধীরে তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে বসলেন।

ভাগ্য যেন সবার জন্যেই ভিন্ন নাটক রচনা করছিল।

সেই রাতেই বিশেষ এক কারণে কপালকুণ্ডলাও একাকিনী সেই বনে উপস্থিত। কপালকুণ্ডলার ননদিনীর দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানো কুলীন স্বামীকে কোনও মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে বশ করতে হলে একটি বিশেষ ধরনের গুল্ম চাই, যা আবার নাকি একাকিনী কোনও নারীকে অন্ধকার রাত্রিতেই বন থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সমুদ্রতীর আর অরণ্যে রাত বিরেতে ঘুরে বেড়ানো

একাকিনী বালিকার কাছে এ কোন ব্যাপারই নয়। ওদিকে তান্ত্রিক যজ্ঞ শেষ করে এ অচেনা অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে বনের ভিতর এক পরিত্যক্ত কুটিরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। আর তখনই অরণ্যের ভিতর ঔষধী গুল্ম খুজতে খুজতে কপালকুণ্ডলা দূর থেকে যজ্ঞস্থলের অগ্নিশিখা দেখতে পেয়ে কাছে চলে এল।

জায়গাটি ফাঁকা, কিন্তু পাশে কুটিরের ভেতর থেকে ভেসে আসছিল দুজনের কথোপকথন। কোন কিছু না বুঝলেও কপালকুণ্ডলা তাঁর নামটি যে উচ্চারিত হয়েছে তা শুনতে পেল। বাকি কথা যতটুকু শুনতে পেল মনে হল— এখানে কারও প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র চলছে।

এই সময় কুটিরের ভেতর থেকে নির্দেশ এল— বাইরে গিয়ে দেখে আসা হোক কেউ গোপনে শুনছে কি না।

তান্ত্রিকের আদেশে ছদ্মবেশী মতি কুটির থেকে বেরিয়ে এসেই দেখতে পেলেন কপালকুণ্ডলাকে।

আশ্চর্য হয়ে গিয়ে কিছুটা সংকোচ ভাঙতেও মতি নিজেকে নারী বলে প্রকাশ করলেন।

বিদায়ের আগে মতি কপালকুণ্ডলাকে জানালেন— তাঁরা যে-পরামর্শ করছেন, তা আসলে তাঁরই বিরুদ্ধে।

সব কথা পরে জানাবেন বলে মতি তাকে অপেক্ষা করতে বলে আবার কুটিরের ভিতর ফিরে গেলেন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও বাকি কথা না শুনেই কপালকুণ্ডলা নিজের বাড়ির পথে রওনা দিল।

যেতে যেতে কপালকুণ্ডলার মনে হল, কেউ যেন তাঁকে অনুসরণ করছে।

অরণ্যে বিচরণে অভ্যস্তা কপালকুণ্ডলা এতে বিচলিত হল না, পথ চলতে লাগল।

হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল।

ক্ষণিক আলোর ঝলকে যে মুখটি কপালকুণ্ডলা দেখতে পেল এ চেহারা তাঁর অচেনা নয়—

এ যে সেই সমুদ্রতীরের বালিয়াড়িতে ভৈরবীর সেবক— সেই নরঘাতী কাপালিক, তাঁরই পালক।

১০.

পরদিন সকালে কপালকুণ্ডলা ঘরের জানালার বাইরে কুড়িয়ে পেল এক টুকরো কাগজ। হাতে তুলে পড়ে দেখে এটা যে তাঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে— 'আজ সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে দেখা করবে।'

দিনভর কপালকুণ্ডলা চিন্তা করল সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে যাওয়া, অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করা কি উচিত হবে? চিঠিতে এও বলা হয়েছে তাঁরই সম্বন্ধে নাকি বিশেষ কিছু কথা আছে। গতরাতে কা'কে যে হত্যা করার কুপরামর্শ তাঁর কানে এসেছে এতে কপালকুণ্ডলা নামটি ও বেশ স্পষ্ট শোনা গেছে। সে ভাবল বিদ্যুতের আলোয় দেখা কাপালিকই যদি সেই ঘরের ভিতরের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হয়ে থাকে তবে তো কপালকুণ্ডলার সামনে বিপদ, এটা নিশ্চিত। অনেক ভেবেচিন্তে কপালকুণ্ডলা পুরুষবেশী সেই নারীটির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াই স্থির করল। তাছাড়া ননদিনীর জন্য বিশেষ একটি গাছের লতা সংগ্রহ করার গোপন কাজও তো বাকি রয়েছে।

ওদিকে কপালকুণ্ডলা কুড়িয়ে পাওয়া চিঠিটি পড়ে চুলের বেণীতে গুঁজে রেখে ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কখন যে চিঠিটি বেণী থেকে খসে পড়ে গেছে বুঝতে পারেনি। কিন্তু কাগজটি পড়ে গেছে নবকুমারের হাতে। চিঠি পড়ে নবকুমার খুবই বিব্রত হল।

কেন তাঁকে রাত্রিতে বনের ভিতর যেতে বলা হচ্ছে? তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল ব্রাহ্মণকুমারই বা কে? সমস্ত ব্যাপারটি নবকুমারের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

সন্ধ্যার পর সত্যিই কপালকুণ্ডলা চুপিসাড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে নবকুমারও চুপি চুপি তাঁর পেছনে চলল। পথে দেখা সেই কাপালিকের সঙ্গে। কাপালিক বললেন তাঁর কিছু কথা আছে। নবকুমার ধরেই নিয়েছে এ ব্যক্তি তাঁকে বলি দেবার জন্য এসেছে। ইতিমধ্যেই স্ত্রীর এ ধরনের আচরণে নিতান্তই ক্ষিপ্ত, দুঃখিত নবকুমার কাপালিকের কাছে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল সে বলির জন্য প্রস্তুত, সেদিন সে পালিয়ে গিয়েছিল, তবে আজ সে

আর পালাবে না। জীবনের ভার তার কাছে আজ দুঃসহ।

কাপালিক তাঁর আগের কথা সব বলল— কী করে সেদিন পালিয়ে যাওয়া ব্রাহ্মণ সন্তানকে খুঁজতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তাঁর দুটি হাত ভেঙে গেলেও কোনও মতে সে প্রাণে বেঁচে আছে। কিন্তু ভৈরবীর পূজা তাঁর আজও অসম্পূর্ণ রয়েছে। তাঁর ভাঙা হাতে খড়্গ ধরা অসম্ভব। তাই অন্যের সাহায্য চাই। কাপালিক নবকুমারকে জানাল এবার তাঁর লক্ষ্য নবকুমার নয়, পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলাই। যে-মেয়েটি তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাঁকেই ভৈরবীর পায়ে উৎসর্গ করে পূজা সাঙ্গ করতে কাপালিকের এতদূর আসা। এ কাজে নবকুমারের সাহায্য চায় কাপালিক।

নবকুমারকে কাপালিক নিয়ে গেল সেই স্থানে যেখানে ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলা দেখা করতে গেছে। দূর থেকে পুরুষবেশী মতিবিবির সঙ্গে কপালকুণ্ডলার অন্তরঙ্গ কথোপকথনের দৃশ্য দেখে নবকুমারের মনে স্ত্রীর প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, ক্রোধ জেগে উঠল, নিজের মনের ভিতর আত্মঘাতী প্রবণতাও জেগে উঠল। তাঁর নিজেরও বেঁচে থাকার আর কোনও ইচ্ছে নেই। ঠিক মুহূর্তে কাপালিক তাঁর হাতে মদের পাত্র তুলে দিলে সে আকণ্ঠ পান করে কাপালিকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে ভৈরবীর পায়ে কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেল।

কপালকুণ্ডলাকে বনের মধ্যে কীজন্য ডেকে নেওয়া হয়েছে এসব কিছুই নবকুমারের জানার কথা নয়, সেই ব্রাহ্মণকুমার যে আসলে পুরুষবেশী মতিবিবি বা পদ্মাবতী, কপালকুণ্ডলারই সপত্নী তা তো নবকুমারের জানার কথা নয়। পদ্মাবতী নবকুমারকে নিয়ে আগ্রায় রাজ আনুকূল্যে নতুন জীবন শুরু করার লক্ষ্যে এতদূর এগিয়েছে, সে যে কপালকুণ্ডলার কাছে নবকুমারের জীবন থেকে সরে যাবার আবেদনও নিয়ে এসেছে এসব কিছুই নবকুমারের জানার কথা নয়।

ঘরে ফেরার পথে নবকুমার আর কাপালিকের মুখোমুখি হয়ে গেল কপালকুণ্ডলা। কাপালিকের কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করে বলল— 'পিতা, তুমি কি আমাকে বলি দিতে এসেছ?' কপালকুণ্ডলা স্বেচ্ছায় কাপালিকের কাছে আত্মসমর্পণ করল। এবং তাঁর আদেশ মতো চলল।

তীব্র মদিরার প্রভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে নদীতীরে সেই যজ্ঞস্থলে নিয়ে গেল। পূজা এবং বলির সমস্ত আয়োজন এখানে রাখা আছে। কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে নদীতে স্নান করিয়ে আনতে নবকুমারকে আদেশ করল মতিবিবির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কপালকুণ্ডলা চরম আত্মত্যাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেই নিয়েছে ইতিপূর্বে। তাঁর চোখের সামনে ভৈরবীর রুদ্ররূপ স্পষ্ট হয়ে উঠল; তিনি যেন তাঁকেই চাইছেন।

গঙ্গার কাছে যেতে যেতে হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে নবকুমার একেবারে ভেঙে পড়ল। কপালকুণ্ডলাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য অনুনয় বিনয় করে বলল; 'কপালকুণ্ডলা, তুমি আমাকে বাঁচাও। একবার বল যে তুমি অবিশ্বাসিনী নও, আমি তোমাকে ঘরে নিয়ে যাই।' নির্ভীক নিরপরাধ কপালকুণ্ডলা বলল, 'তুমি তো আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করনি— আমি কেন বনমধ্যে গেলাম, যাঁর সঙ্গে দেখা করলাম তাঁর প্রকৃত পরিচয় কী কিছুই জানতে চাওনি।'

নবকুমার উন্মাদের মতো বলল, 'আমি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিলাম।'

কপালকুণ্ডলা বলল, 'তুমি যাঁকে দেখেছ সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসী নই। তবে আমি আর ঘরে ফিরে যাব না। আমি মা ভবানীর পায়ে নিজেকে নিবেদন করেছি। তুমি যাও, ঘরে ফিরে যাও। আমার জন্য ক্রন্দন করো না।'

দু'জনে পায়ে পায়ে একেবারে নদীর তটরেখায় এসে পড়েছে। নবকুমার দু'হাত বাড়িয়ে কপালকুণ্ডলাকে জড়িয়ে ধরতে এগোল। এমন সময় চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল ঢেউ এসে ঠিক যেখানে কপালকুণ্ডলা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই আছড়ে পড়ল। নবকুমার দেখল প্রচণ্ড এক শব্দে নদীর পাড় ভেঙে পড়ল, সে সঙ্গে যেখানে কপালকুণ্ডলা দাঁড়িয়েছিল সে অংশটিও চলে গেল খরস্রোতা জলের টানে। নবকুমার তৎক্ষণাৎ সেই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদীজলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় ভাসতে ভাসতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোন অজানার দেশে গেল?